রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা' : চিরন্তন পিতৃত্বের স্বরূপ

নিপন দাস

ছোটোগল্প রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি বিশিষ্ট দিক। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম ছোটোগল্পকে বিশিষ্ট মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। বাংলা ছোটোগল্পের বৈচিত্র্যময় প্রসার ঘটে মূলত তাঁর হাতেই। পল্লিজীবনের আশা-নিরাশা, সাধারণ মানুষের সুখ-আনন্দ-বেদনা, সূক্ষ্ম মানবজীবনবোধ রবীন্দ্রগল্পের উপজীব্য। তাঁর গল্পের আঙ্গিক ও বক্তব্য বিস্ময়কর উৎকর্ষ লাভ করে ভাবের একমুখিনতায়। জীবনের গভীরতর সত্যের সন্ধান রবীন্দ্রগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সীমার মধ্যে অসীম, ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎ ও মহৎকে প্রকাশের প্রয়াসই রবীন্দ্রগল্পকে অনন্যতা দান করেছে। রবীন্দ্রনাথ গ্রামবাংলার নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করেন পূর্ণ যৌবনে, জমিদারি দেখার সূত্রে। আর এই পল্লিজীবনের বিচিত্র-বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাঁর গল্প রচনার মুখ্য উপাদান। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত পরিবারের চির পরিচিত নানান দৃশ্যকেই রবীন্দ্রনাথ সজীব করে তুলেছেন তাঁর গল্পবিশ্বে। তাই আমরা সহজেই রবীন্দ্রগল্পে মনোনিবেশে সমর্থ। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য সমূহ আমরা এভাবে সূত্রাকারে উল্লেখ করতে পারি।

১. গল্পসমূহ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অভিজ্ঞতার ফসল।

২. গল্পে চরিত্রের প্রাধান্য বেশি।

৩. দেশ-কালের গণ্ডিতে গল্পসমূহ সীমাবদ্ধ নয়।

৪. বিশুদ্ধ-সংযত হাস্যরসের সঞ্চার।

৫. গল্পশেষে পাঠকের মনের অতৃপ্তি।

৬. গল্পে কাব্যরস, গীতিধর্মিতার সার্থক উপস্থাপন।

৭. অতি-প্রাকৃত রসের বিশিষ্ট প্রয়োগ।

৮. পূর্ণাঙ্গ অবয়বের গল্প।

আমাদের আলোচ্য 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বিশ্ববন্দিত গল্প। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে। 'সাধনা'

পত্রিকায়। গল্পটি রচিত হয়েছে উত্তম পুরুষের জবানিতে। গল্পে গল্পকার স্বয়ং রয়েছেন কথকের ভূমিকায়। চরিত্রপ্রধান এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথের বহুচর্চিত ও বহুপ্রশংসিত গল্প। ব্যতিক্রমী বিষয়বস্তুতে সমৃদ্ধ গল্পটি বাংলা সাহিত্যের এক অভিনব সংযোজন। সমালোচক লিখেছেন--

> "...রবীন্দ্র ছোটগল্পের এই ঐশ্বর্যপর্বের বিচিত্র সম্ভারের মধ্যে নানারসের বিভিন্ন গল্পাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। কাবুলিওয়ালা গল্পটির মূল বিষয় নিখিল পিতৃহৃদয়ের অনুভব। উনিশ শতকের শেষ অধ্যায়ের বাংলাদেশের শিক্ষিত এক মানুষের সঙ্গে একাত্মবোধে জড়িত সুদূর আফগানিস্তানের অশিক্ষিত কাবুলিওয়ালার এই কাহিনী বাংলা ছোটগল্পের উজ্জ্বল এক ফসল।"[১]

আলোচ্য গল্পের মূল বিষয় পিতৃহৃদয়ের ধারাবাহিক উন্মোচন। গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র রহমত কাবুলিওয়ালা। রহমতের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সহায়ক হয়েছে অন্যান্য চরিত্রসমূহ। উল্লেখ্য যে গল্পটিতে বিভাবের কাজ করেছে পাঁচ বছর বয়সের মিনির উপস্থিতি। তাকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় রহমতের হৃদয়সত্তার। আকারে সংক্ষিপ্ত গল্পের অন্তর্নিহিত সুরটির বিস্তৃতি দীর্ঘসময়ের। মিনি-রহমতের পারস্পরিক সম্পর্কের সূচনা-ক্রমবিকাশ-পরিণতি ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরে গল্পটি বিন্যস্ত।

কাবুলিওয়ালা অর্থাৎ কাবুল দেশের বাসিন্দা। যিনি ফলাদি বিক্রি করেন।[২] একসময় ভারতে বিশেষ করে কলকাতায় কাবুলদেশীয় বহু লোকের ভিড় দেখা যেত। আলোচ্য গল্পে রহমতও ঘুড়ে বেড়ান শহর কলকাতায়। কাবুলে তৈরি নানান সামগ্রী বিক্রির উদ্দেশ্যে। কলকাতার কোনো এক রাস্তাতেই মিনি জানালা দিয়ে প্রথম দেখতে পায় কাবুলিওয়ালা রহমতকে। শিশুসুলভ স্বাভাবিক কৌতূহল বশত মিনি সহজেই কাবুলিওয়ালার প্রতি আকর্ষিত হয় গল্পে। আবার 'ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে'[৩] কাবুলিওয়ালাকে আসতে দেখে মিনি দৌড়ে পালায় বাড়ির অন্দরমহলে। কাবুলিওয়ালার অনুরোধে আর মিনির অমূলক ভয় দূর করার জন্যে মিনির বাবা অন্দরমহল থেকে মিনিকে নিয়ে আসেন। প্রথম পরিচয়-সাক্ষাতে মিনি ও রহমতের মধ্যে কোনো কথোপকথন হয় না। গল্পকার লিখেছেন--

> "...কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিস্‌মিস্ খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনিভাবে গেল।"[৪]

প্রথম পরিচয়ে মিনি কোনো কথা না বললেও গল্পের কাহিনির অগ্রগতির সঙ্গে উভয়ের মধ্যে স্থাপিত হয় এক গভীর সম্পর্ক। গল্পকার নিপুণভাবে ধীরে ধীরে

কাবুলিওয়ালার মূল স্বরূপ উদঘাটন করেছেন আলোচ্য গল্পে। কাবুলিওয়ালা তাঁর সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসহ উপস্থিত হয়েছেন আলোচ্য গল্পে।

প্রথম পরিচয়ের পর ক্রমে মিনি-রহমতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করে। অনর্গল কথা বলে মিনি রহমতের সঙ্গে। রহমতও ধৈর্য সহকারে শুনেন মিনির কথা। এই অসম বন্ধুত্ব সত্যিই বিরল। মিনির বাবার অগোচরে তৈরি হয় এই বন্ধুত্ব। বাড়ির অন্দরমহলে উক্ত সম্পর্কের বিরুদ্ধে আপত্তি থাকলেও, গুরুত্ব দেন নি মিনির বাবা। মিনি-কাবুলিওয়ালা সম্পর্কে গল্পকার লিখেছেন—

> "কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় আবশ্যকবশত বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও দো-আঁশলা বাংলায় ব্যক্ত করিতেছে।"[৫]

ক্রমে মিনি-রহমতের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। প্রতিদিন রহমত একবার দেখা করতে আসেন মিনির সঙ্গে। গল্পকার লিখেছেন--

> "...কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তাবাদাম ঘুষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র লুব্ধ হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।"[৬]

দুজন অসম বয়সের বন্ধুর কথোপকথন খুব উপভোগ করতেন মিনির বাবা। অতি সূক্ষ্ম কিছু বিষয়ে ঠাট্টা প্রচলিত ছিল মিনি-রহমতের মধ্যে। 'শরৎকালের প্রভাতে একটি বয়স্ক এবং একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য দেখিয়া আমারও বেশ লাগিত"[৭] পাঠকও আমোদ অনুভব করেন। রহমত-মিনির সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা সহজেই অনুমেয় মিনির মায়ের দুশ্চিন্তায়। তাঁর সম্পর্কে গল্পে রয়েছে--

> "রহমত কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি পর্যায়ক্রমে আমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন, "কখনো কি কাহারও ছেলে চুরি যায় না। কাবুলদেশে কি দাসব্যবসায় প্রচলিত নাই। একজন প্রকাণ্ড কাবুলির পক্ষে একটি ছোটো ছেলে চুরি করিয়া লাইয়া যাওয়া একেবারেই কি অসম্ভব।"[৮]

উক্ত প্রশ্নসমূহ অমূলক নয়। কারণ আমাদের সমাজে কাবুলিওয়ালা সম্পর্কে মানুষের

মনে রয়েছে এক ধরনের ভ্রান্ত ধারণা। কাবুলিওয়ালার বাহ্যিক রূপ দেখে আমরা তাঁকে এক পাষাণ-সুদখোর বলেই গণ্য করে থাকি। তাই ছোট্ট মিনির সঙ্গে রহমতের সম্পর্ক নিয়ে মিনির মা শঙ্কিত। অনেকসময় পাঠকও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না উক্ত সম্পর্কের মহত্ত্ব। আর এখানেই গল্পটির বিশেষত্ব। সমালোচক তাই লিখেছেন--

"...তবে রবীন্দ্রনাথ মিনির প্রতি স্নেহপরবশ রহমতকে ঋণের টাকার জন্য ছুরি চালাতে দিয়ে বাস্তবের প্রতি নিষ্ঠা রেখেছেন, সস্তা আদর্শবাদের শিকার হননি।"[৯]

গল্পে রহমত কাবুলিওয়ালার জেলে যাওয়ার ঘটনা প্রাথমিক স্তরে কাবুলিওয়ালা সম্পর্কে আমাদের নঞর্থক ধারণাকেই স্বীকৃতি প্রদান করে। গল্পে মিনির বাবার উক্তিতে আমরা জানতে পারি--

"...আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত— মিথ্যাপূর্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।"[১০]

দুহাত বাঁধা রহমতকে দেখে মিনির বাবা এগিয়ে যান সবিশেষ জানার উদ্দেশ্যে। উত্তেজিত রহমতের মুখে তখনও অশ্রাব্য গালি। কৌতূহলবশত মিনিও হাজির হয় কাবুলিওয়ালাকে দেখতে। মিনিকে দেখে মুহূর্তের মধ্যে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে যায় রহমতের মুখে। তাই সমালোচক লিখেছেন--

"কাহিনী পরিবেশ যখন অপরাধের ছোঁয়ায় রক্তাক্ত, তখনও অসমবয়সী দুই বন্ধুর হাস্যালাপে তা মুহূর্তের জন্য নির্মল কলুষমুক্ত হয়ে ওঠে।"[১১]

জেলে চলে গেলে মিনির বাবার সঙ্গে পাঠকও প্রায় ভুলে যায় রহমতের কথা। মিনিদের সংসারের কাজকর্ম চলছিল স্বাভাবিকভাবেই। মিনিও খুব অনায়াসেই রহমতকে ভুলে যায়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মিনির মধ্যে দেখা দেয় পরিবর্তন। প্রগলভতার পরিবর্তে মিনি এখন লজ্জাবনতা। সমাজের স্বাভাবিক নিয়মেই মিনি এখন শান্ত-স্নিগ্ধ। সমালোচক লিখেছেন--

"...শিশু থেকে কিশোরী এবং একজন পরিপূর্ণ নারী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেকেলে বাঙালি সমাজের স্বাভাবিকতা মেনেই মিনি রচনা করেছে আড়ালের বেড়াজাল। ফলে সেই স্বাভাবিক নিয়মের পথ ধরেই ক্রমে ক্রমে শিশু বয়সের সঙ্গী রহমতকেও ভুলেছে মিনি।"[১২]

আগেকার সমাজব্যবস্থায় কম বয়সেই মেয়েদের বিয়ে হতো। আলোচ্য গল্পেও প্রায় ১৩ বছরেই মিনির বিয়ে। শরৎকালের পূজার ছুটিতেই মিনির বিয়ে--'আমার ঘরের

আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে।"[১৩] খুব উৎসাহের সাথে চলছিল বিয়ের প্রস্তুতি। বিয়ের দিন বাড়িময় চাঞ্চল্যকর পরিবেশ। বন্ধু লোকের আনাগোনা। প্যাণ্ডেলকর্মীরাও ভীষণ ব্যস্ত নানান কাজে। মিনির বাবা ব্যস্ত ক্যাটারার হিসেব পরীক্ষায়। এমন সময় হঠাৎ রহমত কাবুলিওয়ালা এসে হাজির হন মিনিদের বাড়িতে। প্রথমে ধরতে না পারলেও মিনির বাবা রহমতের হাসি দেখে তাঁকে চিনতে পারেন। মধ্যবিত্তের স্বাভাবিক সংস্কার বশত মিনির বাবা, মিনির বিয়ের দিন রহমত কাবুলিওয়ালার উপস্থিতি মেনে নিতে পারেন নি সহজে। গল্পে রয়েছে--

"...কোনো খুনীকে প্রত্যক্ষ দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ কেন সংকুচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।"[১৪]

তাই মিনির বাবা সেদিন রহমতকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেন। রহমত চলে যেতে চাইলেও ইতস্ততভাবে মিনির বাবাকে প্রশ্ন করেন-- "খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?"[১৫]

রহমত কাবুলিওয়ালার চিন্তায় মিনি এখনও 'খোঁখী'। রহমতের বিশ্বাস ছিল মিনি আগের মতোই ছুটে আসবে অন্দরমহল থেকে। তাদের কৌতুকালাপেও কোনো ধরনের বাঁধা জন্মাবে না। জেলফেরৎ রহমত আঙুর ও বাদাম নিয়ে হাজির হন মিনির সঙ্গে দেখা করতে। মিনির বাবার উত্তর--"আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারও সহিত দেখা হইতে পারিবে না।"[১৬] রহমত মিনির বাবার হাতে বাদাম-কিসমিস দিয়ে চলে যেতে চাইলেন। মিনির বাবা দাম দিতে গেলে কাবুলিওয়ালা রহমতের হৃদয়স্পর্শী জবাবে চিরন্তন বাৎসল্য রসের সঞ্চার করে পাঠকমনে। গল্পে রয়েছে--

"...আপনার বহুৎ দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে--আমাকে পয়সা দিবেন না।--বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কী আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কী আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।"[১৭]

রহমতের উক্ত বক্তব্যে মিনির বাবার সঙ্গে পাঠকও হয়ে যান স্তব্ধ। রুক্ষ-কর্কশ-সুদখোর কাবুলিওয়ালার প্রতি আমাদের সাধারণ ধারণার বৈপরীত্য ঘটে যায় এখানেই। রহমতের যে একখানি পিতৃহৃদয় থাকতে পারে--তা পাঠকমন কখনো ভাবেনি। মিনির বাবার সামনে টেবিলের ওপর রহমত মেলে ধরেন একটুকরো ময়লা কাগজ। যা তাঁর মেয়ের একমাত্র স্মৃতি। বিদেশে তাঁর সম্বল। গল্পকার লিখেছেন--

"দেখিলাম, কাগজের উপর একটি ছোটো হাতের ছাপ। ফোটোগ্রাফ নহে তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভুষা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণ চিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমত প্রতি বৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে-- যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশুহস্তটুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী বক্ষের মধ্যে সুধাসঞ্চার করিয়া রাখে।"[১৮]

উক্ত হাতের ছাপ দেখে মিনির বাবার সঙ্গে পাঠকের মনও হয়ে ওঠে ভারাক্রান্ত। অনুভূত হয় এক অসহ্য যন্ত্রণা। কাবুলে রহমতের মেয়েটি হয়তো অপেক্ষায় রয়েছে-- রহমতের ফেরার। এই দীর্ঘ সময়ে কোনো যোগাযোগ ঘটেনি তাদের মধ্যে কথাগুলো ভাবতে ভাবতে মিনির বাবার চোখে জল চলে আসে। তিনি তখন উপলব্ধি করেন-- "...তখন বুঝিতে পারিলাম সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল।"[১৯]--এই উপলব্ধিটিতেই প্রকাশ পেয়েছে গল্পটির মূল সুর। আর উক্ত উপলব্ধিটি সার্থক ছোটোগল্পের দাবি পূরণেও সমর্থ। মিনির বাবার এই আত্মোপলব্ধি চিরন্তন পিতৃত্বের কথাই প্রতিষ্ঠিত করে বারবার। বাংলাদেশ-কাবুলের ভৌগোলিক দূরত্ব এক মুহূর্তে শেষ হয়ে যায় উক্ত উপলব্ধিতে। দুই ভিনদেশী পিতৃহৃদয় এক সরলরেখায় উপনীত হয় উক্ত উপলব্ধির মাধ্যমে। তাই সমালোচক লিখেছেন--

"এই আত্মআবিষ্কারে গল্পটি রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। নিখিল পিতৃহৃদয়ের একাত্মতায় গল্পটি সমস্ত ভৌগোলিক ব্যবধান ঘুচিয়ে কাছে এনেছে দুই বিপরীত প্রান্তবাসী, সাংস্কৃতিক ব্যবধানে পৃথক দুই ভিন্নভাষী পিতাকে, সমস্ত বিভেদ সত্ত্বেও বাৎসল্য-স্নেহ ধারায় যারা এক ও অভিন্ন।"[২০]

পিতৃহৃদয়ের হাহাকার অনুভব করে মিনির বাবা বাড়ির ভেতর থেকে মিনিকে ডেকে পাঠান। সকলের আপত্তি অগ্রাহ্য করে তিনি প্রাধান্য দেন বাৎসল্য প্রেমকে। কারণ মিনির বাবার হৃদয়ে 'কাবুলিওয়ালা'র পোশাকি রূপের পরিবর্তে বড়ো হয়ে ওঠে কাবুলিওয়ালার স্নেহাতুর রূপটি। মিনি যথাসময়ে এসে হাজির হয় রহমতের সম্মুখে। আর তখনই রহমত হয়ে যান এক নির্বাক্ শিশু। কোনোমতে নিজেকে সামলে মিনির সঙ্গে আলাপ জমাতে গিয়েও ব্যর্থ হন রহমত। রহমতের 'খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি যাবিস।"[২১]--প্রশ্নে মিনি নিরুত্তর হয়ে থাকে। আজ মিনির বিয়ে শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে সে সচেতন। গল্পকার লিখেছেন--

"মিনি এখন শ্বশুরবাড়ির অর্থ বোঝে, এখন আর সে পূর্বের মতো উত্তর দিতে

পারিল না-- রহমতের প্রশ্ন শুনিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।"[২২]

বিয়ের কন্যাবেশী মিনি অন্দরমহলে চলে গেলে রহমত অনুভব করেন মোক্ষম আঘাত। তাঁর মনে পরে যায় নিজের কন্যার কথা। রহমতের হৃদয়ে বিরহ-বেদনা তখন চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। গল্পকার লিখেছেন-- "মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড়ো হইয়াছে, তাহার সঙ্গে আবার নূতন আলাপ করিতে হইবে-- তাহাকে ঠিক পূর্বের মতো তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বৎসরে তাহার কী হইয়াছে তাই বা কে জানে।"[২৩]

মিনির বাবা তখন বিয়ের খরচ কমিয়ে রহমতকে কাবুলে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ছোটোগল্পের একমুখিনতা এখানে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। "ছোট গল্প নিজের একান্ত বক্তব্যটি ছাড়া আর কিছুই বলবে না। অনাবশ্যক ব্যাপ্তির সুযোগ তার নেই, অহেতুক চরিত্রের ভিড়ে তাকে ভারাক্রান্ত করা চলবে না, অপ্রয়োজনীয় বর্ণনা-বিলাসের কোনো ভূমিকাই সেখানে নেই।"[২৪] --ছোটোগল্পের উক্ত শর্তসমূহ আলোচ্য 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মূল সম্পদ। গল্পকার প্রতিমুহূর্তে সচেতন ছিলেন কাবুলিওয়ালা রহমতের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটনের জন্য। গল্পশেষে আমরা দেখি এক চিরন্তন সত্যের প্রকাশ দেখিয়েছেন গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাবুলিওয়ালা ও তাঁর কন্যার মিলনের মাধ্যমে মিনির মঙ্গল-কল্যাণ হবে--মিনির বাবার এই সিদ্ধান্তেই জয় ঘোষিত হয়েছে মানবতার।

আলোচ্য 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে এক অভিনব সংযোজন বাংলা সাহিত্যে। বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাসে মাতৃহৃদয়ের হাহাকারের বহু বর্ণনা আমরা পাই। কিন্তু একজন পুরুষের নজরে পিতৃহৃদয়ের এমন সুন্দর-গভীর বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। আর গল্পটির সমাপ্তিও খুব অপ্রত্যাশিত। পাঠকের অন্তরে অতৃপ্তির রেশ থেকে যায় বলেই গল্পটি 'শেষ হয়েও হইল না শেষ।'

সূত্রনির্দেশ